সূচীপত্র

সেকশন ১: নির্বাচিত অংশ - 'নৈরাজ্য ব্যবস্থা'[১]

শাইখ আবু বাকর নাজী রাহিমাহুল্লাহ

সূচনা (প্রেক্ষাপট)

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজনের উপর, তাঁর সাহাবীগণের উপর এবং তাঁদের উপর যারা তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন।

বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের যে ধারাগুলো আছে তার মধ্যে কেবল পাঁচটির সুনির্দিষ্ট, লিখিত কর্মপরিকল্পনা আছে। দাওয়াত ও তাবলীগ, আত্মশুদ্ধি কেন্দ্রিক (তাসফিয়া ও তারবিয়া) সালাফি ধারা (বা 'সুফী সালাফি' ধারা), শাসক শ্রেণীর তত্বাবধানে চলা সালাফি ধারাকে, এবং এগুলোর মতো অন্যান্য ধারাগুলোকে আমরা সঙ্গত কারণে আলোচনার বাইরে রাখছি।

যেসব আন্দোলন বা দলের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নেই তাদেরকে বাইরে রাখার পর দেখা যাচ্ছে, এমন মোট পাঁচটি ধারা আছে যাদের লিখিত কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা আছে। এই কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা তাদের ব্যবহারিক বাস্তবতার দরুন আলোচনা-পর্যালোচনার দাবি রাখে। ধারাগুলো হল -

১। মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ধারা। (আন্তর্জাতিক সংগঠন। ইখওয়ানুল মুসলিমীন এই ধারার প্রথম সংগঠন বলা যায়।)[২]

২। হাসান তুরাবির ইখওয়ানের ধারা।[৩]

৩। সাহওয়া সালাফি ধারা। যার প্রতিনিধিত্ব করেন শাইখ সালমান আল আওদা এবং শাইখ সাফার আল-হাওয়ালী।[৪]

---

[১] রচনার সময়কাল ২০০২/০৪ এর মধ্যে

[২] উপমহাদেশের জামাআতে ইসলামী এই ধারার অন্তর্ভুক্ত

[৩] হাসান আল-তুরাবি (১৯৩২–২০১৬) ছিলেন একজন সুদানি রাজনীতিবিদ ও মডার্নিসম প্রভাবিত আলেন। তিনি প্রাথমিকভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি পড়াশুনা করেন খারতুম, লন্ডন এবং প্যারিসে। ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (NIF)-এর নেতা হিসেবে ১৯৮৯ সালের অভ্যুত্থানের পর সুদানে ইসলামাইযেইশানের নেতৃত্ব দেন, তবে পরবর্তীতে ওমর আল-বশিরের সরকারের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। ব্রাদারহুড দ্বারা আদর্শিকভাবে প্রভাবিত তুরাবি ইসলামী ফিকহ ও আধুনিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন।

[৪] সাহওয়া সালাফি আন্দোলন: সূচনা ১৯৮০-এর দশকে সৌদি আরবে। ১৯৯০-এর দশকে এটি শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ ধারাটি মুসলিম ব্রাদারহুড; বিশেষ করে সাইয়্যেদ কুতুব এবং হাসান আল-বান্না-এর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। সাহওয়া সালাফি ধারা মূলত সালাফি আকীদাহ-মানহাজ এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের সাংগঠনিক পদ্ধতির সমন্বয় করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে ছিল প্রতিষ্ঠান গঠন, অ্যাক্টিভিসম, দাওয়াহ এবং শিক্ষা। সালমান আল-আউদাহ এবং সাফার আল-হাওয়ালিকে এ আন্দোলনের প্রধান নেতা বলা যায়। ৯০ এর দশকের শুরুর দিকে সৌদি রাজপরিবারের কর্মকান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা প্রভাব বৃদ্ধির ফলে সমাজে অসন্তোষ বাড়ে, এ প্রেক্ষিতে সাহওয়া আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সাহওয়াহ আন্দোলনের শেকড় পাওয়া যায় সুরুরি ধারার মাঝে। এটি শুরু করেন শাইখ মুহাম্মদ সুরুর বিন নাইফ যাইন আল-আবিদিন। তিনি প্রথম জীবনে সিরিয়ার মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬০-এর দশকে সিরিয়া ছেড়ে তিনি সৌদি আরব চলে আসেন। সেখানে শিক্ষা ও দাওয়াহ কার্যক্রমে কাজ করেন। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড ছেড়ে সালাফি আকীদাহ-মানহাজ এবং ব্রাদারহুডের সাংগঠনিক পদ্ধতির সমন্বয়ের প্রথম চেষ্টা করেন, যা পরবর্তী সময় সাহওয়ার চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক চাপের কারণে শাইখ সুরুর সৌদি আরব ছাড়েন। তিনি জর্ডান, তারপর যুক্তরাজ্যে এবং শেষে দোহা, কাতার-এ বসবাস করেন। তিনি ২০১৬ সালে দোহাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি আল-আওদাহ এবং আল-হাওয়ালী, দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ও নির্যাতনের পর তারা তাদের আগেকার বিভিন্ন অবস্থান ত্যাগ করেন। সামগ্রিকভাবে সাহওয়া ধারা প্রভাব হারাতে থাকে। বর্তমানে সৌদিতে সাহওয়া আন্দোলন বিলুপ্ত বলা যায়। তবে পশ্চিমা বিশ্বে দাওয়াহর সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য সংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সাহওয়া ধারার অনেক বিষয় গ্রহণ করেছেন যদিও তারা সরাসরি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত নন বা অনেকক্ষেত্রে এই ধারার ব্যাপারে তেমন কিছু জানেনও না।

৪। সালাফি জিহাদি ধারা।

৫। জনপ্রিয় জিহাদের ধারা (যেমন: হামাস, মোরো লিবারেশন ফ্রন্ট ইত্যাদি)

মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানের ধারা

মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানের তত্ত্ব ও বাস্তবতার মাঝে কোন মিল নেই। চমকপ্রদ স্লোগান আর লিখিত তাত্ত্বিক কর্মপরিকল্পনা দিয়ে তারা যুবকদের আকৃষ্ট করে। তারপর যুবকদের এই সমর্থনকে ব্যবহার করে তাদের বিদআতি মানহাজ এবং ধর্মনিরপেক্ষ কার্যক্রম চালায়। এমনকি তারা স্লোগান দেয় [الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا] অর্থাৎ 'জিহাদই আমাদের পথ এবং আল্লাহর পথে মৃত্যুই আমাদের সর্বোচ্চ কামনা' অথবা 'আমাদের আন্দোলন একটি সালাফি আন্দোলন'। আবার তারা এই স্লোগানই দেয় যে, 'আমাদের আন্দোলন একটি সূফীবাদী আন্দোলন'।

হাসান তুরাবির ইখওয়ানের ধারা

তুরাবির ইখওয়ানের ধারাকে মূল ইখওয়ানুল মুসলিমীনের একটি ভগ্নাংশ বা প্রশাখা বলা যায়। এই ধারা প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি থেকে ততটুকুই গ্রহণ করেছে যতটুকু একটি রাষ্ট্র (সুদান) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল। হাসান তুরাবি, ওমর আল-বাশিরের সহযোগিতায় রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করেছিল। যদিও পরে তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়য়। এ ধারাটি শরিয়তের কিছু বিধানকে অবহেলা করেছে, কিছু বিধানকে বিকৃত করেছে। যার ফলে তাদের রাষ্ট্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যেখানে ইসলাম নেই, কেবল ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা আছে। ব্যাখ্যা দিতে গেলে এবং এদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হবে।

সাহওয়া সালাফি ধারা

'সাহওয়া সালাফি' ধারার কার্যক্রমের ইখওয়ান তথা ব্রাদারহুডের আন্দোলনের সাথে অনেকখানি সাদৃশ্যপূর্ণ। বিশেষ করে সাহওয়া সালাফি ধারা সর্বশেষ পর্যায়ে 'প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'র যে নীতি গ্রহণ করেছে তা হুবহু ইখওয়ানের মতোই। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেখাবো যে, হাজার বছর চেষ্টা করলেও এই আন্দোলন প্রাথমিক ধাপই পার করতে পারবে না। কারণ, এই আন্দোলন প্রকৃতির স্বাভাবিক কিছু নিয়মনীতিকে (যা শরিয়ার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ) বহুলাংশে উপেক্ষা করেছে[৫]। যার কারণে এধরনের আন্দোলন এক দুষ্টচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে কুফফার, তাগুতী শক্তি এবং সুযোগ সন্ধানী মুনাফিকরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ আন্দোলনগুলোকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। তবে ইখওয়ানের সাথে সাহওয়া সালাফি ধারার একটি ইতিবাচক পার্থক্য হল, সাহওয়া সালাফি ধারা তাদের তত্ত্বকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করে। কাগজেকলমে যা আছে, তারা অন্তত সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।[৬]

---

[৫] কিতাবের মূল শব্দটি হল, السنن الكونية ইংরেজিতে একে Universal Laws বলা যেতে পারে। এখানে আসুসুনান শব্দটি সুন্নাহর বহু বচন। যার অর্থ নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি। الكونية শব্দটি এসেছে الكون থেকে। যার অর্থ আসে, সৃষ্টিজগত, মহাজগত।
সে হিসেবে পুরো শব্দটির অর্থ হল, সৃষ্টিজগতের নিয়ম, মহাজাগতিক নিয়ম।

[৬] ৯/১১, ২০০১ এর হামলার আগ পর্যন্ত সাহওয়া সালাফি ধারার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু ৯/১১ এর পর তারাও যে উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের কথা তারা কাগজেকলমে বলে থাকে তার অনেক কিছুই বাস্তবতা বাদ দিয়েছে, এবং ইখওয়ানের পথ ধরেছে।

সালাফি জিহাদি ধারা[৭]

আমি মনে করি, সালাফি জিহাদি ধারা শরয়ী নীতি এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতির সমন্বয়ে একটি কার্যকর পদ্ধতি এবং পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এবং তা অনুসরণ করছে। যদিও এই পদ্ধতিটি আল্লাহ্ প্রদত্ত, তবে এর বাস্তবায়নকারীরা মানুষ। অন্যান্য মানুষের মতো তাদের মাঝেও সীমাবদ্ধতা আছে, আছে অপূর্ণাঙ্গতা। মানুষ মাত্রই ভুল করে। তাই অন্য সবার মতো তাদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। এধরণের ভুলের উদাহরণ আমরা ইসলামের প্রথম যুগেও দেখি। বর্তমানে আরো বেশি ভুল হওয়া স্বাভাবিক যেহেতু পূর্ববর্তীরা ছিলেন নিঃসন্দেহে ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ। এই বাস্তবতা বুঝার জন্য পাঠক শাইখ ওমর মাহমুদ আবু ওমর[৮] এর 'المثالية والواقعية' [idealism and realism] নামক প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

সালাফি জিহাদি ধারার কিছু কার্যক্রম এমন কিছু কিছু ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছে, যেগুলো মূলত অলংঘনীয় তাকদিরের অংশ। যেগুলো কোনো ভাবে পরিবর্তন হওয়ার নয়। এই আন্দোলনের কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতির ধাপগুলো সংকলিত হয়েছে শরীয়াহ্ নীতি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতির আলোকে। ইনশাআল্লাহ তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু অনুগ্রহ আল্লাহর কাছ থেকে পাবেন যা এখনো গোপন আছে। তাঁরা এবং তাঁদের শত্রুরা এমন এক সংঘাতে লিপ্ত যা নবীরাসূল আলাইহিমুস সালাম–দের সাথে কাফির ও তাগূতদের সংঘাতের অনুরূপ। এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কেউ মানুক বা না মানুক, বাস্তবতা হল, এই সংঘাত পূর্ব থেকে চলে আসা সেই সংঘাতেরই ধারাবাহিকতা।

জনপ্রিয় জিহাদী ধারা

যে চারটি ধারার আলোচনা হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে পাঠক সহজেই জনপ্রিয় জিহাদি ধারার বিষয়টি ধরতে পারবেন। সংক্ষেপে বললে, সালাফি জিহাদি ধারার সাথে এই ধারার মিল আছে। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার দিক থেকে এই ধারা মূল ইখওয়ান এবং তুরাবির ব্রাদারহুডের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। তাছাড়া, অনুসারী এবং কর্মীদের মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে এই ধারা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এই ধারার ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাব্য পরিণতির আশংকা থাকে - এর যোদ্ধাদের কুরবানি ও ত্যাগের দ্বারা অর্জিত ফলটুকু দিনশেষে সেক্যুলার মুরতাদ ও জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে যাবে, অথবা এর মাধ্যমে এমন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যা ওমর আল-বশীর ও হাসান তুরাবীর প্রতিষ্ঠিত সুদানের মতো হবে – অর্থাৎ নামে ইসলামী কিন্তু কার্যত সেকুলার। এর ব্যাখ্যা দিতে আলোচনা দীর্ঘ হবে।

---

[৭] গ্লোবাল জিহাদের ধারা

[৮] শাইখ আবু কাতাদাহ আল ফিলিস্তিনি

প্রাথমিক কিছু কথা

'সাইক্স-পিকট' [১] এর যুগ থেকে বিশ্ব যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে

কোন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের (ইসলামিক কিংবা অনৈসলামিক) পতনের পর একই মাপের অন্য কোন শক্তির উত্থানের আগ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলকে পরিবর্তন ও পুনঃগঠনের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। হাজার হাজার বছর আগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমরা এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কোন শক্তির পতনের পর অনুরূপ কোনো শক্তি সৃষ্টি হবার আগ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নৈরাজ্যের ব্যবস্থাপনা'। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ঐ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং সহিংসতা বিরাজ করে। এটা মানবচরিত্রের অমোঘ ফলাফল।

ইসলামী খিলাফতের পতনের পর কিছু কিছু এলাকায় এই নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সাইক্স-পিকট চুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে খুব দ্রুত ওসব এলাকায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। খিলাফতের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলো আলাদা হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক দখলদার শক্তিগুলো মুসলিম বিশ্ব থেকে শারীরিকভাবে সরে আসে। খিলাফার অধীনে থাকা সুবিশাল অঞ্চল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নগগঠিত রাষ্ট্রগুলো শাসনভার গ্রহণ করে সামরিক সরকার অথবা সামরিক শক্তি সমর্থিত বেসামরিক (সিভিল) সরকার।

নবগঠিত সরকারগুলোর টিকে থাকা নির্ভর করতো সামরিক বাহিনীর সাথে তাদের সম্পর্ক আর রাষ্ট্রের কাঠামো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ঐ সামরিক বাহিনীগুলোর সক্ষমতার উপর। অর্থাৎ খিলাফাহর পতনের পর সৃষ্ট রাষ্ট্রগুলোর অখন্ডতা নির্ভর করে দুই ধরনের শক্তির ওপর –

- পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মতো বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি
- যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রগুলো গঠিত হয়েছিল, সেই আন্তর্জাতিক শক্তি

সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা অর্জন করে হোক কিংবা গোপন আঁতাত করে দখলদার সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর হয়ে হোক –এই রাষ্ট্রগুলো এক সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার বলয়ে আবর্তিত হতে শুরু করলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ হল জাতিসংঘ। আর এর ভিতরের আসল রূপটি হল দুই পরাশক্তির অধীনে দুটি মেরু। এ দুই পরাশক্তি ছিল অর্থাৎ

- আমেরিকা-USA,
- সোভিয়েত রাশিয়া-USSR।

আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার নিজ নিজ মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সামরিক জোট নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই দুই মেরু। যেভাবে গ্রহকে কেন্দ্র করে উপগ্রহ আবর্তন করে তেমনি ভাবে এই দুই পরাশক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো বিভিন্ন ছোটছোট ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো।

---

[১] সাইকস-পিকট (Sykes–Picot) চুক্তি, যা সরকারিভাবে এশিয়া মাইনর চুক্তি নামে পরিচিত, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি। এতে রাশিয়ারও সম্মতি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার উদ্দেশ্য এতে বিবৃত হয়। ১৯১৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৬ সালের মার্চের মধ্যে চুক্তির আলোচনা চলে এবং ১৯১৬ সালের ১৬ মে এটি চূড়ান্ত হয়। এই চুক্তির আওতায় আরব উপদ্বীপের বাইরে উসমানীয় সাম্রাজ্যের আরব অঞ্চলগুলো ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ ও ফরাসি নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়। ফরাসি কূটনীতিক ফ্রাঁসোয়া জর্জ পিকট এবং ব্রিটিশ কূটনীতিক স্যার মার্ক সাইকস চুক্তি প্রস্তুত করেন। রাশিয়ার জারপন্থী সরকার এতে একটি অংশীদার ছিল এবং তাদের জন্য কনস্টান্টিনোপল এবং দার্দানেলেসের দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রুশ বিপ্লবের পর বলশেভিকরা এই চুক্তি প্রকাশ করে। এতে ব্রিটিশরা বিব্রত হয় এবং আরবরা প্রতারিত বোধ করে। তুর্কিরা এই ফাঁস হওয়া তথ্যকে তাদের শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ হিসেবে দেখে।

আনুগত্যের বিনিময়ে পরাশক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া গোলাম রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা পেত। তবে পরাশক্তির কাছ থেকে আসা এই সাহায্য ছিল সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো যেত কিছু নির্দিষ্ট মানুষের পকেটে - যেমন ক্ষমতাসীন সরকারের প্রভাবশালী নেতা কিংবা শক্তিশালী সামরিক কমান্ডাররা এগুলো ভোগ করতো।

কিছুদিন এই অবস্থা চললো। তারপর কিছু কিছু সরকারের পতন ঘটলো। তাদের জায়গায় নতুন সরকার আসলো। এ উত্থানপতনের ব্যাপারটা ঘটলো এভাবে –

- ঐ সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে ছিল সেই পরাশক্তি তার সমর্থন সরিয়ে নিল। কিংবা পরাশক্তির ইচ্ছা থাকলেও উক্ত সরকারের পতন ঠেকাতে পারলো না।
- অথবা অপর পরাশক্তি সরকারবিরোধী কোন দলকে ক্ষমতাসীনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে বা অন্য কোন ভাবে (বিশ্বজগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে) সরকারের পতন ঘটিয়ে তার জায়গা দখল করতে সাহায্য করলো।[১০]
- যেসব শাসকগোষ্ঠী স্থিতিশীলতা হতে পারলো, তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। ক্ষমতাসীন সরকার যে পরাশক্তির বলয়ে অবস্থান নিল, সেই পরাশক্তির চিন্তা-চেতনা আর মূল্যবোধের সাথে নিজেদের চিন্তাচেতনাকে মিশিয়ে এক মিশ্রিত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সমাজের উপর চাপিয়ে দিল। এই সব মূল্যবোধ যতোই অযৌক্তিক কিংবা সুস্থ বিচারবুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন, ক্ষমতাসীনরা এগুলোকে উপস্থাপন করলো পবিত্র এবং মহিমান্বিত হিসাবে।[১১]
- এই সরকারগুলো তাদের শাসনাধীন সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে শুরু করলো। কালের পরিক্রমায় তারা রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করে নষ্ট করে দিল, ফলে মানুষের মাঝে অন্যায়-অবিচার-দুর্বৃত্তি-অপরাধ বেড়ে গেল।

শক্তি বা ক্ষমতার দুটি ধরণ

দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হয় দুইভাবে।

- সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে ,অথবা
- (আকিদাহ কিংবা সত্যের ভিত্তিতে না হয়ে) কেবল জুলুম প্রতিহত করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে। কারণ যুলুম প্রতিরোধ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা মুমিন-কাফের সবার কাছেই সমাদৃত বিষয়।

আবার যেসব শক্তি এ দু পদ্ধতির কোন একটির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করতে পারে, তাও দুই ধরণের।

---

[১০] ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙ্গে বাংলাদেশে গঠনের মধ্যে উপরে আলোচিত প্রক্রিয়ার বাস্তবতা বিদ্যমান। ৭১ এর সঙ্ঘাতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী (এবং সামরিক বাহিনী) ছিল আমেরিকার বলয়ে। অন্যদিকে ভারত ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বলয়ে। মুজিবসহ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকে ভারত সমর্থন দিয়েছিল। তাজউদ্দিন, নজরুল ইসলাম, সিরাজুল আলমের মতো লোকেরা কট্টর ধর্মনিরপেক্ষে এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা লালন করতো। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করেছিল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জানমাল-সম্মান বাঁচাতে।

[১১] স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারন করা হয়, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, এবং গণতন্ত্র। যদিও এই দর্শনগুলোর সাথে বাংলার আমজনতার কোন পরিচয় ছিল না, সমর্থনও ছিল না। তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক এলিটরা এই সংবিধান বাংলার মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়। একইভাবে 'পরাশক্তির চিন্তা-চেতনা আর মূল্যবোধের সাথে নিজেদের চিন্তাচেতনাকে মিশিয়ে এক মিশ্রিত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ' হিসেবে 'হাজার বছরে বাঙ্গালী চেতনা' নামে এক শিরকপ্রভাবিত এবং কট্টরভাবে ইসলামবিরোধী সংস্কৃতি তারা চাপিয়ে দেয়।

জনগণের শক্তি বা ক্ষমতা

এই শক্তিকে আজ অত্যন্ত চতুরতার সাথে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। হাজারো ছলচাতুরির মাধ্যমে একে ব্যস্ত রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। যেমন, জীবিকা নির্বাহের তাগিদে দুনিয়াবী কাজ-কর্মে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। জীবনে সফলতার চূড়ায় পৌছাতে হবে, এমন ধ্যান ধারনা মন মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে অধরা লক্ষ্য পূরণের পেছনে মানুষকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। উসকে দেয়া হয়েছে মানুষের পেট আর যৌনাঙ্গের ক্ষুধা। জাগিয়ে দেয়া হয়েছে সম্পদ অর্জনের অতৃপ্ত স্পৃহা। এভাবে নানাভাবে জনগণের শক্তিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে ব্যস্ত রাখা হয়েছে।

এছাড়া মিডিয়ার প্রতারণাপূর্ণ মগজধোলাই এবং সমাজে সুফিবাদী, মুরজি এবং জাবারি[১২] চিন্তাভাবনার প্রসারের মাধ্যমে জনগনের শক্তির যে একটা অন্তঃর্নিহিত কার্যকারীতা আছে সেটাই ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে জনসাধারনের এই অপ্রতিরোধ্য শক্তি কখনোই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

মাঝেমধ্যে যেসব মানুষ গাফেলতি ও উদাসীনতা থেকে জেগে উঠে তাদেরকে সেনাবাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি ব্যবহার করে কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রে পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ সব সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রধান ও মৌলিক দায়িত্বের অন্যতম হল জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তিকে দমন করা। এ দায়িত্ব পালনের সুচারুভাবে পালনের শর্তেই তারা অর্থকড়ি, উপঢৌকন অর্জন করে। এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীনরা সুরক্ষিত থাকে এবং নিজেদের পছন্দের পরাশক্তিকে বলয়ে আবর্তন চালিয়ে যেতে পারে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি

অপর যে শক্তিটি – সমাজের হারানো বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধার করতে পারে, তা হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি। তবে এ শক্তি কেবল আংশিক ভাবে সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তির বিষয়টা সরকারগুলো জানে। তাই তাদের লুটপাট করা অর্থ-সম্পদ হাত খুলে তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর পেছনে খরচ করে। এভাবে বাহিনীগুলোকে এমনভাবে কিনে ফেলে, যেন তারা কোনভাবে এই কাজে আগ্রহী না হয়। বরং বিশ্বস্ততার সাথে ক্ষমতাসীনদের গদি সুরক্ষিত রাখে।

শয়তানী চিন্তার আগ্রাসন সত্ত্বেও এসব বাহিনীতে অল্প কিছু ন্যায়পরায়ণ মানুষ থাকেন যারা অন্যায়ের বিরোধিতা করেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চান। যতোটুকু শক্তি আছে তা দিয়েই তারা পরিস্থিতিকে তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অনুকূলে পরিবর্তন করতে চান। কিন্তু এই বাহিনীগুলোর মধ্যে এমন শক্তিও থাকে যা অপরাধী, দুর্নীতিপরায়ণ। যারা বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরোয়া করে না। এই দ্বিতীয় দলের ব্যাপারটিও প্রথম দলকে বিবেচনা করতে হয়।

এমন অবস্থায়, সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো ফলাফল কী হতে পারে? ধরা যাক, সামরিক বাহিনীর ভিতরে থাকা এই দু'পক্ষ কোনভাবে ঐক্যবদ্ধ হল। কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ অংশকে নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব হল এবং ক্ষমতাসীনদের পতন ঘটানো হল।

তারপর কী হবে? তখন—

- কোন এক পরাশক্তি বা উভয়ই জাতিসংঘের ব্যানারে ছলেবলে কৌশলে, শক্তি কিংবা চাপ প্রয়োগ করে, নতুন সরকারকে কোন এক পরাশক্তির ক্ষমতা বলয়ে নিয়ে আসতে উঠে পড়ে লেগে যাবে।
- বাছাই করা বিভিন্ন লোককে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে নতুন সরকারকে বাধ্য করবে।

---

[১২] আল জাবারিয়াহ- একটি বাতিল ফিরকা। এদের গোমরাহী ক্বাদর বা তাকদীর নিয়ে। তারা মনে করে আমরা সবাই অনেকটা জড় পদার্থের মতই। আল্লাহ যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবেই সব হচ্ছে, অতএব এখানে বান্দার কিছুই করার নেই।

- ফলে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ নিয়ে যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারাও একসময় আগের সরকারের মতো হয়ে যাবে। সুদানের ওমর আল-বাশির এর ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে।[১৩]

এসব কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভিতরে থাকা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা সরকার পরিবর্তনের চিন্তা থেকে সরে আসে। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে মেনে নেয়। মনের কষ্ট ও তিক্ততা নিয়ে তারা নিজেদের গুটিয়ে রাখে। তাদের মধ্যে যারা সত্যিকারভাবে সৎ, তারা সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে পদত্যাগ করে। যারা সামরিক বাহিনীতে থেকে যায় তারা দ্রুত অন্ধকার ও অবক্ষয়ের চোরাবালিতে আটকা পড়ে যায়।

'ধর্ম-টর্ম বলে কিছু নেই' কিংবা

'খাও দাও ফুর্তি কর, সরকারকে সাপোর্ট কর'-এর মতো স্লোগানের আড়ালে সবকিছু চাপা পড়ে যায়।

খিলাফাহ্‌র পতনের পর থেকে এই হল মুসলিম উম্মাহ্‌র অবস্থা।

---

[১৩] একইরকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৯/১১ এর ঘটনার পূর্বে আফগানিস্তানে তালিবান শাসনামলে, যদিও তার রূপটি ছিল একটু ভিন্ন। এই ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘ অবরোধ আরোপ করে দেশকে নিঃশেষ করে ফেলা। তারপর সুবিধাজনক সময়ে বিরোধীদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করা এবং প্রতিবেশী দেশ থেকে জনবল পাঠিয়ে বিরোধীদের সাপোর্টের মাধ্যমে তালিবানকে উৎখাত করা।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায়

বৈশ্বিক জিহাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে খিলাফাহ বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গোটা বিশ্বের ভূখন্ডগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে;

১। প্রথম সারি বা অগ্রগণ্য ভূমিসমূহ (Primary Lands)

২। দ্বিতীয় সারি বা অবশিষ্ট ভূমিসমূহ (Secondary Lands)

এ দু'ধরনের ভূখন্ডে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজের ধাপ আলাদা আলাদা।

অগ্রগণ্য ভূমিসমূহের ধাপ

- প্রথমে 'ক্ষতিসাধন ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ' পর্ব।[১৪]
- তারপর 'নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা' পর্ব।[১৫]
- তারপর 'ক্ষমতা অর্জন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা' পর্ব।

---

[১৪] ক্ষতিসাধন ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ: এর দ্বারা এমন সামরিক কর্মকান্ডকে বুঝানো হচ্ছে যার দ্বারা সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে না। বরং ক্রমাগত ছোট ছোট আঘাতের মাধ্যমে সরকারের ক্ষতি করা এবং শক্তি ক্ষয় করা এধরনের কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্টভাবে এধরণের হামলার লক্ষ্য হল:

শত্রু বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের শক্তিক্ষয় করা এবং ক্লান্ত করে তোলা।

তাদের বাহিনী এবং সামর্থ্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে বাধ্য করা।

মান সম্পন্ন অপারেশনের মাধ্যমে নতুন যুবকদেরকে জিহাদের দিকে আকৃষ্ট করা।

ধারাবাহিক অনুশীলন ও অপারেশনের মধ্য দিয়ে অপারেশন চালনা করা মুজাহিদীন গ্রুপের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন। যেন তারা 'নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা'পর্বের জন্য মানসিকভাবে ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদেরকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিতে পারে।

[১৫] নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা: কোন শক্তির পতনের পর অনুরূপ কোনো শক্তি সৃষ্টি হবার আগ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নৈরাজ্যের ব্যবস্থাপনা'। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ঐ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং সহিংসতা বিরাজ করে। সংক্ষেপে **নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হল, 'চরম ও বর্বর বিশৃংখল পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা'**

ধরা যাক, কোন অঞ্চলে রাজনৈতিক শুন্যতা এবং তারপর যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হল। স্বীকৃত-অস্বীকৃত কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শাসন কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ সেখানে আর থাকলো না। চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা তৈরি হল। এমন অবস্থায়, সক্ষমতা অনুযায়ী সেই অবস্থাকেঃ

- নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া,
- নিজ দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,
- টেকসই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়,
- ঐ অঞ্চল পূনর্গঠনের মাধ্যমে একে ভবিষ্যতে নিজস্ব মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করার

-পুরো কার্যক্রমকে একত্রে 'নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা' বলা যায়।[১৫]

এ হল সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। আর বিস্তারিত সংজ্ঞা ব্যক্তিভেদে আলাদা হবে। নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে আরও যা থাকে -

- নৈরাজ্য কবলিত অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারীদের খাদ্য ও চিকিৎসার চাহিদা পূরণ করা,
- তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,
- সে অঞ্চলে বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা,
- বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে সীমান্তকে নিরাপদ রাখা ,
- যারা এই নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলে অনাচার তৈরির চেষ্টা করবে তাদেরকে প্রতিহত করা,
- প্রতিরক্ষামূলক টাওয়ার ও অন্যান্য স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা

ইত্যাদি নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অবশিষ্ট ভূমিসমূহের ধাপ

- ➢ প্রথমে ‘ক্ষতিসাধন ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণ’ পর্ব।
- ➢ ‘ক্ষমতা অর্জন ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা’ পর্ব।

তবে অবশিষ্ট ভূমিগুলোতে বিজয় ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার করার জন্য **প্রয়োজনীয় মূল ক্ষমতা ও শক্তি বাইরে থেকে আসবে।**

অগ্রগণ্য হিসাবে চিহ্নিত ভূমিসমূহ

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহর আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায়[১৬] নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল ‘অগ্রগণ্য’ হিসাবে উঠে এসেছে। এই অঞ্চলগুলোর উপর বিশেষভাবে নজর দেয়া মুজাহিদীনের দায়িত্ব। তাদের শক্তি এই অঞ্চলগুলোতে প্রয়োগ করতে হবে। ঐসব অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে শক্তি ও সময় খরচ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যেখানে তেমন বড় কোন ফায়দা আসবে না। এভাবে শেষপর্যন্ত দুই বা তিনটি সম্ভাব্য অঞ্চলের উপর ফোকাস করলে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রস্তুতি যাচাই করা সম্ভব হবে।

(উল্লেখ্য) পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এতে পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। ওই গবেষণা সেপ্টেম্বরের যুগান্তকারী ঘটনার (৯/১১) তিন বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই ঘটনা এবং তার পরের ধারাবাহিক বিভিন্ন ঘটনার আলোকে নেতৃবৃন্দ (তাদের পরিকল্পনায়) কিছু পরিবর্তন এনেছেন।

এটি ছিল (আমাদের নির্ধারিত) মূলনীতির আলোকে তৈরি করা একটি তালিকা। বলাবাহুল্য, এটি হল একটি প্রাথমিক বাছাই।

এখন এই অগ্রগণ্য অঞ্চলের ভাইদের – যারা আল্লাহর সাথে এবং নিজেদের সাথে কৃত ওয়াদায় সত্য - গভীর দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, এখানে সুপরিকল্পিত আন্দোলন চালানো সম্ভব কি না? এ হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমাদের বাছাই অনুযায়ী এগুলো সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র। তবে এই তালিকার সবগুলো ভূখণ্ডের বদলে কেবল দুই বা তিনটি ভূখন্ডে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে কোনো সমস্যা নেই, বরং কখনো কখনো হয়তো এমন করাই উত্তম হবে।

এই দুটি বা তিনটি ভূখন্ডে সুপরিকল্পিতভাবে, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী তৎপরতাকে এগিয়ে যাবে। অগ্রগণ্য ভূখন্ডগুলোর মধ্যে যেগুলো বাকি রয়ে যাবে সেগুলোতে দ্বিতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলোর মত কাজ চলতে থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে কাজে অবিচল রাখেন এবং হেদায়েতের পথে দৃঢ় মনোবল দান করেন।

কোন ভূমিগুলোকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা হবে?

যেসব অঞ্চলে নৈরাজ্য তৈরি হতে পারে, সেগুলোতে নিচের সবগুলো অথবা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

১। ভৌগলিক গভীরতার (strategic depth)[১৭] উপস্থিতি এবং এমন ভূ-প্রকৃতি যা ‘নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা অঞ্চল’ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক।

---

[১৬] শাইখ (আবু মুসআব আস-সূরী) ওমর আব্দুল হাকিম হাফি.র দাওয়াতুল মুকাওয়ামা / The Global Islamic Resistance Call। প্রাসঙ্গিক অংশ এই ফাইলের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। সেকশন ২ দ্রষ্টব্য।

[১৭] ভৌগলিক গভীরতা (strategic depth) -

২। ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্বলতা। সরকারের শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া। কেন্দ্র থেকে দূরে সীমান্তবর্তী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারের নিয়ন্ত্রন দুর্বল হওয়া। অনেক সময় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে খুব ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলেও সরকারের নিয়ন্ত্রন দুর্বল হওয়া।

৩। এসব অঞ্চলে ইসলামী তথা জিহাদী চেতনা এবং দাওয়াতের জোয়ারের উপস্থিতি।

৪। ঐ অঞ্চলের মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কিছু ভূমিকে অপর কিছু ভূমির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

৫। ওই অঞ্চলের লোকদের হাতে হাতে অস্ত্র থাকা বা অস্ত্রের সহজলভ্যতা।

সৌভাগ্য যে, আল্লাহর ইচ্ছায় বেশিরভাগ অগ্রগণ্য ভূখণ্ডগুলো প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। যে কারণে এসব অঞ্চলকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করা যেকোন রাষ্ট্রের জন্যই কঠিন।

<u>অবশিষ্ট ভূমিগুলোর অবস্থা:</u>

এর বাইরে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর কী অবস্থা?

মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অনেক অঞ্চল আছে যেখানে উল্লেখযোগ্য হারে জিহাদী জোয়ার তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে সেপ্টেম্বরের সেই যুগান্তকারী হামলা ও পরবর্তী ঘটনাবলীর পর। কিন্তু এসব অঞ্চলের কিছু দুর্বলতাও আছে। যেমন –

- এসব অঞ্চলের ক্ষমতাসীন সরকারগুলো শক্তিশালী, তাদের শক্তি মজবুত।
- সেখানে সরকারবিরোধী শক্তি বা অঞ্চল অনুপস্থিত।
- এমন কোন দুর্গম অঞ্চল নেই যা মুজাহিদগণ কাজে লাগাতে পারবেন।
- ভূপ্রাকৃতিক কারণে মুজাহিদিনের স্বাধীন চলাচলের সুযোগ নেই।
- এছাড়া এসব অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি পুরোপুরিভাবে (এধরনের তীব্র যুদ্ধের) উপযোগী না।

তবে এসব কারণে, এসব অঞ্চলে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা যাবে না। বরং এখানে শত্রুর 'ক্ষতিসাধনের' অপারেশন শুরু করে দিতে হবে।

মূল কথা হল (বিস্তারিত পরে আসবে ইনশাআল্লাহ), মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলে- তা প্রথম সারির [অগ্রগণ্য] হোক কিংবা দ্বিতীয় (অবশিষ্ট) সারির –

- বিভিন্ন গ্রুপ ও বিচ্ছিন্ন সেলের মাধ্যমে 'ক্ষতিসাধন ও ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণমূলক' অপারেশন চলতে থাকবে।
- এসব অপারেশনের ফলে অগ্রগণ্য অঞ্চলগুলোতে ক্ষমতাসীন সরকারের নিয়ন্ত্রন কমে আসবে। দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চলে সরকারের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কমতে থাকবে। একসময়
  - অগ্রগণ্য ভূমিগুলোতে কাংক্ষিত নৈরাজ্য এবং বিশৃংখলার পরিস্থিতি তৈরি হবে।
  - **অবশিষ্ট ভূমিগুলোতে ক্ষমতাসীন সরকারের শক্তি, মজবুতি ও পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য কারণে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হবে না।**

নৈরাজ্য পরিস্থিতি তৈরি হবার পর (অগ্রগণ্য) অঞ্চলগুলো ধীরে ধীরে 'নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনা' ধাপের দিকে এগুবে।

আর অবশিষ্ট ভূমিগুলোতে নিচের দুইভাবে কাজ চলতে থাকবে।

১। তারা অগ্রগণ্য নৈরাজ্যপূর্ন অঞ্চলগুলোর জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট পাঠাবে লজিস্টিক সাপোর্ট বলতে আমি অর্থ, মুজাহিদীনের জন্য নিরাপদ ঘাঁটি, রসদ সংরক্ষণ, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি বুঝাচ্ছি।

২। **বাইরে থেকে বিজয় আসার আগ পর্যন্ত** সরকারগুলোর বিরুদ্ধে এ অঞ্চলগুলোতে 'ক্ষতিসাধন এবং ক্রমঃশক্তিক্ষয়করণমূলক' অপারেশন চালাতে থাকবে।

…অনেক সময় আকস্মিকভাবে এমন কোন অঞ্চলে সরকারের পতন হতে পারে বা অন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে, যা অগ্রগণ্য অঞ্চল না। এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে—

- যদি ঐখানে এমন কোন ইসলামী সংগঠন থাকে যারা এই নৈরাজ্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করে যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম, তাহলে তারা নৈরাজ্য ব্যবস্থাপনার ছক অনুযায়ী আগাবে।
- যদি এমন কোন ইসলামী সংগঠন যদি সেখানে না থাকে, তাহলে এসব অঞ্চল খুব শীঘ্রই অনৈসলামিক সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রনে যাবে। অথবা ক্ষমতাসীন সরকারের পতনের পর তাদের অবশিষ্ট কোন অংশের হাতে যাবে। কিংবা সংঘবদ্ধ মিলিশিয়া বা এধরনের দলের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেকশন ২: নির্বাচিত অংশ - 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ'[18]

শাইখ আবু মুসআব আস-সুরি

[শাইখ নাজী লিখেছেন - *"সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহর আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল 'অগ্রগণ্য' হিসাবে উঠে এসেছে। এই অঞ্চলগুলোর উপর বিশেষভাবে নজর দেয়া মুজাহিদীনের দায়িত্ব..."*— এখানে শাইখ আবু মুসআব আস-সুরির গবেষণার কথা উঠে এসেছে। প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় শাইখের গবেষণার কিছু অংশ নিচে যুক্ত করা হলো। উল্লেখ্য, নিচের আলোচনা শাইখ আবু মুসআবের বিখ্যাত কিতাব **দাওয়াতুল মুকাওয়ামা**-এর ৮ম অধ্যায় থেকে নেয়া]

অগ্রগণ্য ভূমির বৈশিষ্ট্য:

ভৌগোলিক পূর্বশর্তঃ

- ভূমির প্রশস্ততা (strategic depth)
- বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘ সীমানার উপস্থিতি।
- ভূমির প্রকৃতি এমন হতে হবে যা অবরোধ করা কঠিন।
- আংশিক দুর্গম পার্বত্য এলাকা অথবা গহীন জঙ্গল অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা বেষ্টিত ভূমি থাকতে হবে। এই ধরণের ভূমি শত্রুদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধর জন্য জরুরী। সবচেয়ে উত্তম হয় যদি গাছপালায় আচ্ছাদিত পার্বত্য এলাকা থাকে।
- এছাড়াও এমন ভূমি হওয়া প্রয়োজন যেন অবরোধের সম্মুখীন হলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে।

জনসংখ্যাগত পরিস্থিতিঃ

এই ভূমিতে বিশাল সংখ্যক অধিবাসীদের উপস্থিতি থাকলে ভাল। এর ফলে শত্রুপক্ষ চাইলেই মুজাহিদদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবে না। আর মুজাহিদরাও জনবহুল গ্রাম্য এলাকাগুলোতে এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারবেন। এছাড়াও, এই এলাকার যুবকদের মধ্যে লড়াই করার ক্ষমতা, জেদ, কোন কিছু পিছনে লেগে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায় – এই সকল গুণাবলীর উপস্থিতি থাকতে হবে। সবচেয়ে বেশী জরুরী যেটা সেটা হচ্ছে ওই এলাকায় অস্ত্র সহজলভ্য হতে হবে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিঃ

এই ভূমিতে এমন একটা রাজনৈতিক পরিবেশ থাকতে হবে যেন সেখানকার অধিবাসীরা সহজেই আল্লাহ্-র জন্য জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রতিরোধ শুরু করতে হলে এমন একটা সময়ে এমন একটা বিষয় নিয়ে করতে হবে যেন সেখানকার মুসলিম উম্মাহকে সচল করতে সক্ষম হয়। যদি সঠিক সময়ে সঠিক বিষয়টি উম্মাহর সামনে তুলে ধরা যায় তবে উম্মাহ এই প্রতিরোধ সফল করতে সাহায্য করতে পারে। তারা তাদের সমর্থন ও সম্পদ দিয়ে এই জিহাদকে সফল করতে চেষ্টা করবে। যে কোন ভূমিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহবান জানানো।

[18] রচনার সময়কাল ১৯৯৮-২০০৪ এর মধ্যে

এছাড়া ইসলামের কোন বুনিয়াদি বিষয়ের উচ্ছেদ বা পরিবর্তন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বড় রকমের কোন পরিবর্তনগুলোও প্রতিরোধের আহবান জানানোর জন্য যথেষ্ট। গেরিলা যুদ্ধের বইগুলোতে এই ধরণের পরিবেশকে বলা হয় 'revolutionary climate' আর আমাদের পরিভাষায় আমরা বলব 'Jihadi climate'।

উপরোক্ত শর্তসমূহের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তীতে যে সকল ভূমিতে সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল (আফগানিস্থান, চেচনিয়া এবং বসনিয়া) সেখানকার একটা তুলনামূলক অবস্থা আমরা এখন দেখবো ইনশা আল্লাহ্।

দেশ	ভৌগোলিক উপাদান	জনসংখ্যা	রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	ফলাফল
আফগানিস্থান	▪ ৬৫০,০০০০ বর্গকিলোমিটার ▪ শুষ্ক ভূমি। ▪ বহু সম্পদের উপস্থিতি ▪ বর্ডারগুলো দীর্ঘ, এবং উন্মুক্ত।	▪ ২৪ মিলিয়ন জনগণ, অধিকাংশই যুবক ▪ স্থায়ী যোদ্ধা জাতি ▪ অস্ত্রের সহজলভ্যতা	▪ বিদেশী দখলদারিত্ব এবং আক্রমণ ▪ ধর্মীয় কারণ ▪ আফগান জাতির নিজস্বতা বজায় রাখতে চাওয়ার প্রবণতা।	**পূর্ণ সফলতা**
চেচনিয়া	▪ ছোট এলাকা ৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটার। ▪ খুব বেশি rough পরিবেশ। বর্ডার প্রায় উন্মুক্ত। ▪ জীবন ধারনের উপকরণসমূহ অপর্যাপ্ত।	▪ সীমিত সংখ্যক জনগণ, ৮,৫০,০০০ এর মত ▪ সাহসী এবং দৃঢ় মানসিকতার। ▪ অস্ত্রের সহজলভ্যতা	▪ বিদেশী দখলদারিত্ব এবং আক্রমণ ▪ ধর্মীয় কারণ। ▪ জাতীয়বাদ	▪ **সামরিক ক্ষেত্রে সফল** ▪ **দাওয়াহ ক্ষেত্রে সফল** ▪ **এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক ভাবে ব্যর্থ।**
বসনিয়া	▪ ছোট এলাকা, চারপাশে অন্যান্য দেশ দ্বারা আবদ্ধ। ▪ বর্ডারে নজরদারি বেশি। ▪ খুবই এবড়ো থেবড়ো ভূমি। জীবনধারণের উপকরণসমূহের স্বল্পতা।	▪ সীমিত সংখ্যক জনসংখ্যাঃ মাত্র ৪ মিলিয়ন মুসলিম। ▪ যোদ্ধা বা জেদি প্রকৃতির নয়। ▪ অস্ত্র অপ্রতুল।	▪ পশ্চিমা ক্রুসেডারদের গণহত্যা এবং আগ্রাসন। ▪ ধর্মীয় কারণ ▪ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই	▪ **উম্মাহর মাঝে জাগরণ তৈরি করা ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ।**

সম্ভাব্য অগ্রগণ্য ভূমি:

সম্মুখ যুদ্ধে কুফফারদের মোকাবেলার জন্য ইসলামী বিশ্বের যে সকল অঞ্চলগুলো উপযুক্ত এখন আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানবো। পূর্বশর্তগুলির উপস্থিতি সাপেক্ষে যে সকল ভূমি সম্মুখ যুদ্ধের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত সেগুলো হচ্ছে-

আফগানিস্তান:

এই ভূমি কেন উপযুক্ত সে কারণগুলো ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্য এশিয়ার দেশগুলো এবং যে অঞ্চলগুলো নদীর তীরবর্তী স্থানে অবস্থান করছে:

এটা এক বিশাল এলাকা। প্রায় ৫ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারের কাছাকাছি। এই এলকা জুড়ে প্রায় ৫০ মিলিয়ন মুসলিমের বসবাস। সম্মুখ যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানগুলোর উপস্থিতি রয়েছে এখানে। বিশেষ করে কিছু এলাকাতে এখনো সোভিয়েত দখলদারিত্ব রয়ে গেছে। আরও কিছু এলাকায় আমেরিকার অনুপ্রবেশ ও দখলদারিত্ব শুরু হয়েছে। আমেরিকা এই সকল অঞ্চলে নব্য উপনিবেশ স্থাপণের চেষ্টা করছে।

ইয়েমেন এবং আরব উপদ্বীপ:

এটা একটা সুবিশাল এলাকা। আয়তন প্রায় ২.৫ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যার পরিমাণ ৪৫ মিলিয়নের মত। সম্মুখ যুদ্ধের জন্য খুবই সুরক্ষিত ও উপযুক্ত হচ্ছে এই ইয়ামেন। এখানে একটি বিপ্লব শুরু করার মত ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। আমি ইতিপূর্বেই 'আরব উপদ্বীপ এবং এর মুল স্তম্ভ হচ্ছে ইয়ামেন' নামে একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম। সেখানে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মরক্কো এবং উত্তর আফ্রিকা:

এটাও একটা বিশাল এলাকা। এর রয়েছে বিশাল খোলা বর্ডার । দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকা, অনেক পার্বত্যঅঞ্চল এবং প্রাকৃতিক দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত সুরক্ষিত এলাকার কারণে এই অঞ্চল সম্মুখ যুদ্ধের জন্য খুব উপযোগী। এখানে অস্ত্র তুলনামূলক সহজলভ্য। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই এলাকাকে অবরোধ করা খুবই কঠিন কারন এখানে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সাথে সংযুক্ত দীর্ঘ সীমানারেখা। আর এমনিতেও আরব এবং বেদুইন জাতির শক্তি, সাহস এবং লড়াইয়ের দক্ষতা ঐতিহাসিকভাবেই সুপরিচিত। এই অঞ্চলে অস্ত্র খুব সহজলভ্য। এগুলো মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসে। সমুদ্রপথে ইউরোপের সাথে যোগাযোগ এই অঞ্চলকে জিহাদের ভূমির জন্য আরও উপযুক্ত করে তুলেছে। যা কিছুই বলুন, উত্তর আফ্রিকাতে, বিশেষ করে মরক্কোতে জিহাদি আন্দোলনের জন্য বেশীরভাগ পূর্বশর্তগুলো বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক দখলদারিত্ব এবং পশ্চিমা এবং ইহুদীবাদের নিয়ন্ত্রণ জিহাদের স্ফুলিঙ্গকে উন্মুক্ত করার জন্য একটা সোনালী সুযোগ প্রস্তত করে দিবে।

শাম এবং ইরাক:

এটা ৭০,০০০০ বর্গকিলোমিটারের বিশাল এক এলাকা। সম্মুখ যুদ্ধের জন্য যে সকল পূর্বশর্তের প্রয়োজন তার সবই এখানে আছে। বিশেষ করে উত্তর এবং পশ্চিম ইরাকের পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর ও পশ্চিম সিরিয়া এবং লেবাননের অধিকাংশ এলাকা এবং জর্ডান নদীর উত্তর ও পূর্ব দিকের পাহাড়ি এলাকা। পুরো এলাকাতে জনসংখ্যা ৬০ মিলিয়নেরও বেশী।

এখানে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম সহজলভ্য। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাথে বর্ডার, উপকূলীয় অঞ্চল এবং গিরিপথের উপস্থিতি এটাকে বিপ্লবের ভূমি হিসেবে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ইসরাইল এমনিতেই ইসলামী বিশ্বের হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইসাথে আমেরিকার দখলদারিত্ব এই রক্তক্ষরণে এনে দিয়েছে একটা বৈপ্লবিক মাত্রা, যেটা জিহাদের জন্য একটা অসাধারণ চাবি…

সম্মুখ যুদ্ধে যাবার জন্য এই ধরণের আরও এলাকা রয়েছে যেখানে অনেক উপযুক্ত পূর্বশর্ত বিদ্যমান। যেমন – তুর্কী। গেরিলা যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। কারন সকল ধরণের উপরকরনগুলোর উপস্থিতি রয়েছে এখানে। একইকথা বলা যায় পাকিস্থানের ক্ষেত্রেও। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের কিছু এলাকা এবং অনুরূপ আরও কিছু এলাকায় এই ধরণের পূর্বশর্ত গুলোর উপস্থিতি রয়েছে।

যাইহোক, পৃথিবীর ২৫০ এর উপর দেশের মধ্যে ইসলামী দেশ হিসেবে পরিচিত দেশের সংখ্যা ৫৫ টির অধিক। এসকল দেশের সবগুলোই সম্মুখ যুদ্ধে যাবার জন্য উপযুক্ত নয়। উপরোক্ত অঞ্চলগুলো ছাড়া বাকি অঞ্চলগুলোতে হয় একটা বা ২ টা পূর্বশর্তের অনুপস্থিতির কারণে এই গুলো উপযুক্ত ভূমি নয়। আর কোথাও কোথাও দেখা যায় যে সে সকল পূর্বশর্তের উপস্থিতি প্রয়োজন তার একটিও নেই।

এখানে, অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে, যে ভূমি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন। সাধারণত বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেখানকার জনগণকে প্রতিরোধ ও যুদ্ধের পথে উৎসাহিত করে।

অগ্রগণ্য ভূমিতে করণীয়ঃ

কোন এক ভূমিতে সম্মুখ যুদ্ধে যাবার জন্য যে ধরণের রাজনৈতিক পরিবেশ থাকা দরকার বেশীরভাগ আরব এবং ইসলামী দেশগুলোতে বর্তমানে তেমন কোন অবস্থা নেই। তাই এই সকল দেশে এখন সম্মুখ যুদ্ধে যাওয়া যাবে না।

যে সকল মুজাহিদগণ সম্মুখ যুদ্ধ/জিহাদে অংশ করতে চান তাদের জন্য সারা দুনিয়ার সকল সম্মুখ যুদ্ধের ময়দান উন্মুক্ত। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো দল যদি এক আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য হোক পথে চেষ্টা করবেন সেখানেই মুজাহিদিনগণ জিহাদ করার জন্য জড়ো হতে পারবেন।

তবে অবশ্যই এই সংগ্রাম জিহাদের আকিদার পরিপন্থি কোন কিছুর জন্য হতে পারবে না। আরেকটি বিষয় যেটা খেয়াল রাখতে হবে স্থান, কাল, পাত্র যাই হোক না কেন তাদেরকে অবশ্যই একক নেতৃত্বের অধীনে কাজ করতে হবে।

যখন চলমান জিহাদের কোন একটা ফ্রন্টে মুসলিমরা বিজয় পাবে তখন সেখানে তারা ইসলামিক শরিয়াহ বাস্তবায়ন করবে। এই ভূমি হবে ইসলামী ইমারতের কেন্দ্রস্থল, যেটা অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে আল্লাহর শরিয়াহ দ্বারা। যারা আল্লাহর খুসির জন্য জিহাদের উদ্দেশে হিজরত করতে চায় এই ভূমি হবে তাদের কেন্দ্রস্থল ও আশ্রয়স্থল। এখানকার নেতৃত্ব এবং ইমারত হবে সেই দেশের সকল নাগরিকের জন্য।

এখানে খেয়াল করতে হবে- যে ভূমিতে ইসলামিক ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানকার কিছু সামাজিক প্রথা থাকবে যেগুলো অনেক পুরনো। তবে প্রথমেই এই সকল সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না। ইসলামিক ইমারাহ এর উদ্দেশ্যও এটা না যে এতদিনকার সামাজিক রীতিনীতিকে রাতারাতি মুছে দেওয়া। এ সকল সামাজিক রীতিনীতি তুলে দিতে সময় লাগবে। সেখানকার অধিবাসিদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি শিখিয়ে তাতে অভ্যস্ত করানোর মাধ্যমে এ সকল সামাজিক রীতিনীতি সামাজ থেকে উঠিয়ে দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়, *আল্লাহু আলাম।*